দৈনিক বাংলা

20 AUG 1988

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

বৃটিশ শাসনামলে বিশাল পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় বাশিন্দাদের মধ্যে বলতে গেলে আধুনিক শিক্ষার ধারণা ছিল অপরিজ্ঞাত। এই অচল অবস্থা কাটিয়ে ওঠা এবং উৎসাহী উপজাতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৮৬২ সনে চন্দ্রঘোনায় একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এরপর যখন রাঙ্গামাটিতে জেলা সদর সরিয়ে আনা হয় তখন ঐ স্কুলটিও সেখানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৮৯০ সালে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় প্রথম উপজাতীয় যিনি ১৮৯৩ সনে এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। উপজাতীয়দের মধ্যে তার জামাতা জামিনি কুমার দেওয়ান প্রথম গ্রাজুয়েট (স্নাতক) এবং চাকমা রাজকুমার কোকোধানিকা প্রথম মাস্টারস ডিগ্রীধারী। ১৯১৪ সনে জামিনি কুমার এবং ১৯৩৮ সনে কোকোধানিকা যথাক্রমে গ্রাজুয়েট এবং বাংলায় মাস্টারস ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর এখানকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে, কিন্তু বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। এর প্রধান কারণ এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন এবং দুর্গম এলাকায় অধিকাংশ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস। উপজাতীয়দের রক্ষণশীলতা এবং জীবন যাত্রা প্রণালীই যুগ যুগ ধরে তাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে রেখে দেয়। বর্তমানে এ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি), খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন জেলা নিয়ে গঠিত যা অসমতল পর্বত এবং ঘন বন দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ এলাকার মোট ১৩ হাজার ১৭৪ বর্গ কিলোমিটার জায়গার মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৬শ ৮৪ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় যাতায়াত সহজসাধ্য।

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র কটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছটি মাধ্যমিক ইংরেজী স্কুল এবং কুশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ছত্রিশ বছর পরে ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০-এ এবং নিম্নমাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ২২ (বাইশ) এবং ৮৯২ (আটশ' বিরানব্বই)-তে উন্নীত হয়েছে কুল প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। এ রকম দীর্ঘ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। তদুপরি, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বস্তুতঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে উপজাতীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্যে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকারই প্রথম বারের মত এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উপজাতীয় লোকদের পিছিয়ে থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা দূর করার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার সাধনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন:

(ক) বিভিন্ন স্থানে বহু-সংখ্যক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য আসনের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) স্কুল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যথাযোগ্য উপজাতীয় ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) তিন কোটি উনিশ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি জেলা সদরে ৩টি আবাসিক মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটিতে পৃথক পৃথক হোস্টেলে ৭৫ জন ছাত্র এবং ৫০ জন ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল স্কুলে থাকা, খাওয়া এবং শিক্ষার সকল প্রকারের ব্যয়ভার সরকার বহন করে থাকে।

(ঙ) মহলছড়ি, গুইমারা, কলাঘাট, আলী কদম, দক্ষিণ ফটিকছড়ি এবং বেলাইছড়ি প্রভৃতি স্থানে ২ কোটি ৬ লাখ ২৩ হাজার টাকা ব্যয়ে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য ৬টি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সকল ব্যয়ভার সরকার বহন করে থাকে।

(চ) শুধুমাত্র মোরো গোত্রের ছাত্রদের জন্য বান্দরবন ও রামগড়ে আরও দুটি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ দুটি স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার 'ইউনিসেফ' বহন করে থাকে।

বর্তমান সরকারের এই বাস্তব পদক্ষেপের ফলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে এখন শিক্ষার আলো। ১৯৬৫ সনে যেখানে মাত্র ১টি কলেজ ছিল, এখন সেখানে ৭টি কলেজ। ১৯৪৭ সালে যেখানে মাত্র ১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৯৭৬ সনে যেখানে ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল এখন সেখানে ১২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে ১৯৪৭ সালে যেখানে কোন বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে ১৯৭৬ সনে এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টিতে এবং বর্তমানে এর সংখ্যা ৬৫টি। বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি যেখানে ১৯৪৭ সনে ছিল মাত্র ৮টি। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এক হাজারেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন চালু রয়েছে, যেখানে ১৯৪৭ সনে ছিল মাত্র ২১টি।

উপজাতীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তা আরও বৃদ্ধির জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সরকারের এ প্রচেষ্টার সাফল্য ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আমরা দেশে প্রচুর উপজাতীয় চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কারিগর, শিক্ষক, আইনজীবী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দেখতে পাচ্ছি। একথা সত্য যে একমাত্র শিক্ষার বিস্তৃতিই উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাইদের সাথে তারা সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

—খালেদ বেলাল